সম্পাদকের কথা

পৃথিবীর কষ্ট কি আগের মতই আছে?কত শত কোটি বছর কেটে গেল একটি সুন্দর জীবনের আশায়। মানুষ তবু খুঁজে চলেছে নিজের অস্তিত্ব। ফাল্গুনী তিথি আনুক এক স্বর্গীয় সঙ্গীত মূর্চ্ছনা।দেবী সরস্বতী অজ্ঞানতার অন্ধকার মুছে দিয়ে সন্তানদের আলো দেখাবেন এটুকুই প্রত্যাশা।

সম্পাদকঃ পাপড়ি দেব।।

"হিরো" হওয়ার সাধ ও ক্রিয়া

:

কৈশোরে আমার নানাবিধ সখের অন্যতম ছিল "বড়শি বাওয়া"। কেঁচো, তেলাপোকা, মরা চিংড়ি, বিশেষ লাল পোকা বা এক রকম গ্রাম্য ফলকে টোপ বানিয়ে পুকুরে, নদীতে, বিলে বড়শি ফেলতাম আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে। আমার দ্বীপগাঁয়ে প্রচুর মাছের আধিক্য থাকার পরও, আমরা সখে প্রতিযোগিতা করে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাম। একবার স্কুল বন্ধের দিন আমরা নদীর তীরে "পিকনিকের" আয়োজন করলাম। পিকনিক হবে আমাদের ঐদিন বড়শিতে ধরা মাছ দিয়ে। এবং যে সবচেয়ে বড় বা বেশি মাছ ধরে আনতে পারবে, তাকে দেয়া হবে "বিশেষ হিরোর পুরস্কার"। আর পিকনিকের বিশেষ আকর্ষণ হবে রান্নার আগে মাছ নির্বাচন করা, যাতে যোগ দেবে আমাদের স্কুল পড়ুয়া, আমাদের গায়ের হিন্দু মেয়েরা, যারা বিচারক হিসেবে নির্ধারণ করবে কার মাছ ধরা শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কে হলো আজকের "মাছ ধরা হিরো"!

:

কৈশোরে নানা গুণ ছাড়াও আমার অন্যতম দোষ ছিল অস্থিরতা, যা এখনো কমবেশি আমার চরিত্রে বিদ্যমান। তাই প্রথমে নিজ পুকুরে, তারপর বাড়ির দরজার খালে, অবশেষে নদীতে বড়শি ফেলেও ১ ঘন্টায় তেমন বড় কোন মাছ না পেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলাম প্রায় আধা কিলো দূরের বিলের মাঝের পুরণো "কালা পানির দিঘিতে"! কালো জলে পরিপূর্ণ দিঘিটা

আমার জন্মের আগেই ছিল। নদী খাল বিলের জন টলটলে থাকলেও, ঐ দিঘিটার পানি ছিল বেশ কালো, যে কারণে ঐ দিঘিতে ভয়ে নামতাম না আমরা। তা ছাড়া পুরনো দিঘি বলে নানা কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল ঐ দীঘি সম্পর্কে আমাদের গাঁয়ে! ওটাতে নাকি বয়স্ক "অমান" মাছ বসবাস করে অনেক বছর থেকে, যা কখনো মরে না, বুড়ো হয়ে পেকে গেছে তারা!

:

নিজেকে হিরো বানানোর তাগিদে একাকি গোপনে বড়শি ফেলার দুমিনিটের মাথায় প্রবল টান পড়লো বড়শিতে। ছিপে টান দিতেই প্রচন্ড শক্তিতে উল্টো আমাকেই টেনে দিঘির জলে নিয়ে যেতে চাইছে কে যেন। গাছের সাথে ছিপের নাইলনের সুঁতো বেধে বিশেষ কাঠির সাহায্যে ক্রমে সুঁতো টেনে নিয়ে এলাম একদম জলের কিনারায়। ওরে বাবা! এ দেখি কালো দৈত্যকার এক বিশাল অচেনা মাছ। প্রায় এক কিলো ঘাম ছুটিয়ে অবশেষে টেনে একদম দিঘির কিনারে আনতে পারলাম এ অচেনা মাছকে। মাছকে যখন টেনে ওপরে তুলতে যাবো, তখন বিস্ময়করভাবে কথা বললো বিশালাকার মাছটি।করুণ স্বরে বললো - "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এ দিঘির জলদেবতা"। বললাম "না, জলদেবতা টেবতা মানিনা। আমাকে হিরো হতে হবে, তাই তোমাকে নেবই"!

"আমাকে মারলে তোমার অনেক ক্ষতি হবে" - মিনতি করে বললো মাছটি। কিন্তু ওর কোন কথাই শুনলাম না আমি। কলাপাতার রশিতে বেঁধে হাজির

হলাম পিকনিক স্পটে হিরো হতে। প্রায় ১০-১২ কেজির মাছ দেখে কেবল হিন্দু মেয়েদের কাছে নয়, পুরো গাঁয়ে হিরো হলাম আমি। আমার ধরা মাছের কাছে সবার ধরা কই, শোল, বোয়াল হাস্যকর হলো যেন। মহা উৎসবে রান্না হতে থাকলো বিশালকার ঐ মাছ। মাছের খবর শুনে কেবল আমরা কিশোর কিশোরিরা নয়, তাদের মায়েরাও এসে যোগ দিলো এ "বিশাল পিকনিকে"!

:

রান্না শেষে কলাপাতা আনা হলো যাতে সবাই নদীর তীরে বসে খাবে। পাতায় সাজানো হলো নতুন চালের ভাতসহ বিবিধ খাবার। গাঁয়ের রীতি অনুসারে আমরা গেলাম নদীর জলে হাত ধুতে। ওমা এ কি! নদীর পানিতে হাত দিতেই জল দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমি জল ধরতে পারছিনা। সবাই হাত ধুয়ে পাতা নিয়ে খাবার শুরু করেছে। কেবল আমি চেষ্টা করছি নদীর জলে হাত ধুতে। কিন্তু না, যতবার চেষ্টা করছি পানি সরে যাচ্ছে দূরে। এবার নামলাম নদীর পানিতে। বাহ! আমার শরীরের চারদিকের পানি দূরে সরে যাচ্ছে। পুরো মাটি দেখা যাচ্ছে জলতলের। ধর্মক্লাসে শুনেছিলাম হযরত মুসা নবীর অনুরোধে নাকি নীলনদের পানি ভাগ হয়ে গিয়েছিল, এওতো দেখছি তেমনই কান্ড। আমাকে না দেখে বন্ধুরা গলা চিড়ে ডাক শুরু করেছে। স্কুলের হিন্দু মেয়েরা বলছে - "হিরো গেলো কই"! সবার ডাক শুনে হাত না ধুয়ে মাঠের ঘাসে মুছে খেতে বসলাম।

:

আমাকে সম্মান করে বিশাল মাছের মাথাটি কলাপাতাতে সাজিয়ে রেখেছে আমার জন্য। তার দিকে তাকিয়ে ভয় হলো আমার! তবে কি এ ব্যাটা জল স্পর্শ করতে দিচ্ছেনা আমাকে? আমি খুব তাড়াতাড়ি খাবার খাই, তাই খাবার মাঝে মাঝে জল লাগে আমার, না হলে গলায় আটকে যায় খাবার। একটু ভাত গিলেই জল চাইলাম বন্ধু রফিকের কাছে। ওরা আগেই নদীর জলকে মাটির কলসিতে তুলে তাতে ফিটকিরি দিয়ে রেখেছে, যাতে তা পরিস্কার আর জীবাণুমুক্ত হয়। সুমি একগ্লাস পানি নিয়ে এসে ধরলো আমার মুখের কাছে। ওমা! যেইনা পানি খেতে মুখ দিলাম গ্লাসে, ওমনি পুরো গ্লাসের পানি লাফ দিয়ে ভিজিয়ে দিলো আমার ওপরের ক্লাসের সিনিয়র মেয়ে মৌসুমীকে। সে কপট রেগে গিয়ে বললো, ভেজাতে চাওতো সুমিকে ভেজাও! আমাকে কেন? আমিতো তোমার বয়সে বড় তা কি ভুলে গেছো? ভীষণ লজ্জা পেলাম মৌসুমিদির এমন কথাতে!

:

পানি আর খেতে পারলাম না। আমার এমন অবস্থার কথা শুনে মা দৌঁড়ে এলেন আমাদের সখের পিকনিক স্পটে। সবার সামনে মাকে খুলে বললাম দিঘির সব কথা। পরীক্ষা করার জন্য মা নদীতে নামালেন আমাকে। ওহ বাবা! হেঁটে একদম নদীর মাঝে চলে গেলাম আমি। আমি যেদিকে যাই পানি ২-দিকে ভাগ হয়ে যায়। বন্ধুরা সবাই আমার পিছু পিছু নদীর মাঝে হেঁটে এলো। ওরা কেউ কেউ নদীর তলদেশ থেকে অনেক হারানো জিনিসপত্র

তুলে আনলো। মা ভীষণ চিন্তিত হলো আমাকে নিয়ে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে পুরো এলাকায় রটে গেল এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ। খবর পেয়ে হিন্দু বাড়ির সবচেয়ে বুড়ো ৮০-বছরের ঠাকুর হরলাল মন্ডল এলো লাঠিতে ভর দিয়ে। সব শুনে বললো, "জলের দেবতা রুষ্ঠ হয়ে এমন শাস্তি দিয়েছে। এ শাস্তি তুলে নিতে পারে নতুন দেবতা। কারণ আগের দেবতাকে তো আমরা খেয়ে ফেলেছি রান্না করে, এখন নতুন দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে সে হয়তো তুলে নেবে এ শাস্তি"!

মা জানতে চাইলেন কই পাবো নতুন জলদেবতা? কিভাবে তুষ্ট করবো তাকে?

হরলাল কাকা বললেন, নামতে হবে ঐ দিঘির কালো জলে আপনার ছেলে বিল্টুকে একাকি। সেটাও বেশ ভয়ের কারণ। যদি নতুন দেবতা তুষ্ট না হন বা আগের দেবতার স্ত্রী কিংবা সন্তানরা ক্ষেপে থাকে বিল্টুর ওপর, তখন সবাই সম্মিলিত আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে বিল্টুকে।

মা বললেন, তাহলে কি করা্ যায় মন্ডল বাবু?

মন্ডল কাকা বললেন, দেখি পুরনো পুঁথি পুস্তক ঘেটে কোন পথ বের করতে পারি কিনা।

:

এর মধ্যে প্রবল বৃষ্টি নামলো নদীর তীরে। সবাই ভিজে যাচ্ছে প্রচন্ড বৃষ্টিতে কিন্তু আমার গায়ে এক ফোঁটা জলও পড়ছে না। বন্ধুরা সবাই এসে আমার গা-ঘেষে দাঁড়ালো বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। এ দৃশ্য দেখে বন্ধু নিরঞ্জন বললো, একটা কাজ করা যায়। বাজারের কাছে প্যান্ডেল করে সার্কাস দেখানো হচ্ছে। সেখানে বিল্টুকে দেখিয়ে টাকা কামানো যায়। ওর কথামত আমরা ১১-বন্ধু একটু হেঁটে পৌঁছে গেলাম একদম সার্কাস প্যান্ডেলে। আয়োজক ছিল নিরঞ্জনের বাপ-চাচাসহ আমাদের প্রতিবেশিরা। তারা সব শুনে মাইকিং শুরু করলো সর্বত্র --

"ভাইসব, এমন আজগুবি খেলা দেখতে পাবেন, যাতে প্রচন্ড বৃষ্টি হলেও গাঁয়ে একফোটা পানি পড়বে না। পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাবে কিন্তু পা ভিজবেনা"!

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পুরো প্যান্ডেল ভর্তি হলো ১০-টাকা দামের টিকেটে। সবাইর এক দাবী অন্য সার্কাস দেখবো পরে, আগে পানিতে হাঁটার সার্কাস দেখতে চাই। এ খবর চাউর হলে আরো হাজারো মানুষ উপস্থিল হলো সার্কাস প্যান্ডেলের কাছে। মানুষের চাপে ভেঙে পড়লো পুরো প্যান্ডেল। বন্ধুরা পাঁচ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করে প্যান্ডেলের পাশের খালে হাঁটতে বললো আমাকে। জলের ওপর হাঁটা দেখে হাজারো মানুষ খুশিতে হাততালি দিয়ে সার্কাস না দেখে আমার পিছু নিলো সবাই! পানির অভাবে

বুকে ফেটে যাচ্ছে আমার। মা বুদ্ধি করে রসালো ফল খাওয়াতে থাকলো আমাকে যাতে পানির অভাব কিছুটা পুরণ হয়। সারাদিন পানি না পেয়ে গাছের সব শশা খেয়ে সাবাড় করলাম ২/৩ দিনেই। টিচারসহ স্কুলের সবাই দেখতে এলো আমাকে বাড়িতে। এলাকার সব শশা সবাই নিয়ে আসতে থাকলো আমার জন্যে! এবার সত্যিই প্রকৃত হিরো হলাম আমি।

:

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমনে একটা যাত্রীবাহি বড় জলযান ডুবে গিয়েছিল আমাদের নদীতে। যার নাম "ইরানী" ছিল। অনেকদিন ডুবন্ত জাহাজের টপ মাস্তলে "ইরানী" লেখাটা উর্দু আর ইংরেজিতে দেখেছিলাম আমরা। বেশ কবার নৌকা নিয়ে বন্ধুরা জাহাজের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু ডুবন্ত জাহাজ বলে ভেতরে ঢুকতে পারিনি কখনো। এবার বন্ধুরা প্লান করলাম, প্রথমে আমি জাহাজে ঢুকবো তার পিছু পিছু ওরা সবাই। মাস্তল অনেক বছর আগেই ভেঙে গেছে বলে অনুমান করে জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে প্রথমে নৌকো থেকে নামলাম আমি। পা দিয়ে চাপ দিতেই পানি সরে গিয়ে জলের সুড়ঙ্গ পথে দেখতে পেলাম শেওলাপরা পুরনো জাহাজের অংশ। প্লানমতো আমার পিছু পিছু আমার ১১-বন্ধু ঢুকে গেলো জাহাজের ভেতরে। আমি যেখানে হাত দেই বা পৌঁছি সেখানের পানি সরে গিয়ে দৃশ্যমান হয় প্রায় ১৫ বছর আগে ডোবা বৃটিশ নির্মিত বিশালকার যাত্রীবাহি জাহাজের। আমরা ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারলাম জাহাজ থেকে। বেশ কটা কেবিনে মৃত মানুষের কঙ্কাল

দেখলাম আমরা। কারো গলাতে বা হাতে স্বর্ণের অলঙ্কার পেলো বন্ধুরা। প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ঘুরে জাহাজ থেকে অনেক জিনিসপত্র উদ্ধার করলাম আমরা।

:

ইঞ্জিনরুমে বিশালাকৃতির স্টিম ইঞ্জিনের কাছে গেলে সেখানে কালো দিঘির জলে দেবতা মাছটির মত বিশালাকার এক মাছ দেখতে পেলাম। কাছে গেলেই মাছ বললো, তুমি অভিশাপ পেয়েছো জলদেবতা থেকে তাইনা?

বললাম, হ্যা দেবতা! প্লিজ আমাকে একটু হেলপ করবে?

জাহাজের জলদেবতা বললো, তোমাকে কোন হেলপ করতাম না আমি! এটা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ! কিন্তু যাকে তুমি বড়শি দিয়ে ধরে হত্যা করেছো, সে ঐ কালো দিঘির দেবতা হতে দেয়নি আমাকে। তার দলবল নিয়ে বছর পাঁচেক আগে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। তাই এখনো আমার মনের একমাত্র সাধ ঐ দিঘির দেবতা হবো আমি, ঘর করবো মৃত দেবতার বিধবা স্ত্রীকে নিয়ে ঐ দিঘিতে। তুমি যদি আমাকে দলবলসহ তুলে ঐ দিঘীতে অক্ষত নিয়ে যেতে পারো, তবে ওখানের বর্তমান দেবতার সাথে ফাইট দিয়ে যদি আমি দেবতা হতে পারি ওখানের, তবে তুলে নেব তোমার জল অভিশাপ। আবার তুমি সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে পারবে!

:

নানাবিধ টেনশনেও রাতে গভীর ঘুম হলো মরার মত আমার! গভীর রাতে এক স্নিগ্ধ ঘ্রাণময়তা আর আলোয় ঘুম ভেঙে গেল আকস্মিক। চোখ মেলে চোখের ওপর ভাসতে দেখলাম ফ্রিয়াকে। ফ্রিয়া হচ্ছে উপুলু দ্বীপের সেই পরী, যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় তুতুলিয়া দ্বীপে জীবন বাঁচিয়েছিল আমার উইচ হাইতা নামক এক ডাইনি থেকে। বিস্মিত চোখে বললাম ফ্রিয়া তুমি কিভাবে এলে, জানলে কেমনে আমার কথা?

ফ্রি চোখে মুখে হাসির প্লাবন এনে বললো, তুমি আমার অনেক প্রিয়। তোমার ঘ্রাণে এতোদূর আসতে পেরেছি আমি। যখন জানতে পারলাম "জল অভিশাপ" পেয়েছো তুমি, তখন আর বসে থাকতে পারলাম না উপুলু দ্বীপে। তোমাদের এ গাঁয়ে আসতে অনেক বাতাস আর প্রতিকুলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাকে!

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল আমার। ইচ্ছে হলো জড়িয়ে ধরি ফ্রিয়াকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে বললাম, ফ্রিয়া আমি পানি খেতে পারছিনা, স্নান করছে পারছি না। আমি যে মরে যাচ্ছি ফ্রিয়া! তুমি কি আমায় বাঁচাতে পারবে এ জল অভিশাপ থেকে?

ফ্রিয়া বললো, তাইতো ৪-হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এলাম তোমার কাছে।

একটা কাগজে মোড়ানো জিনিস আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা রাখো যত্ন করে। এর মধ্যে পরীর দেশের "বাতাসা" আছে, যা জলদেবতাদের খুব প্রিয়। তুমি একটা বাতাসা কাল সকালে ঐ কালো দিঘির জলে ছুঁড়ে মারবে। ওটার ঘ্রাণ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ২য় বাতাসার লোভে ঐ কালো দিঘির বর্তমান দেবতা জলের ওপর মুখ তুলবে। তুমি তখন বলবে, আরো বাতাসা দিতে পারি, যদি তুমি আমার "জলের অভিশাপ" তুলে নাও। মৎস্য দেবতাদের কাছে পরীর দেশের বাতাসা এতোই প্রিয় যে, সে বাতাসার লোভে তোমার থেকে তাৎক্ষণিক জল অভিশাপ তুলে নেবে।

:

এতো রাতে আমি কার সাথে কথা বলছি, শুনে মা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। আকস্মিক মা ঢুকছে দেখে তাৎক্ষণিক পালিয়ে গেল ফ্রিয়া জানালা দিয়ে। মাকে কি বলবো বুঝতে পারলামনা তখন। সারারাত আর ঘুম হলোনা আমার টেনশনে। ভোর হতেই মাকেসহ দিঘির তীরে উপস্থিত হলাম, যেখান থেকে বড়শিতে তুলেছিলাম দেবতা মাছটিকে। একটা বাতাসা জলে ছুড়তেই জলের মধ্যে প্রচন্ড লড়াইয়ের মত জলতান্ডব হলো। মনে হলো, সম্ভবত ভয়ঙ্করসব দানব মাছেরা ঐ বাতাসার জন্যে লড়াই করছে। কিছুক্ষণপর মুখ তুললো ঐ দিঘির মৎস্য দেবতা। আমার

দিকে বিকট মুখ হা করে বললো, তুমি একবার আমাদের দেবতাকে হত্যা করেছো, আজ আবার এক বাতাসা ছুড়ে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়েছো, তাতে জলতলে ৪-মৎস্য কুমার মারা গেছে তোমার কারণে।

মিনতি করে বললাম, আমাকে ক্ষমা করে মাছ দেবতা। আমি এসব কিছুই জানিনা। তুমি এ বাতাসা নাও। আর আমার জল অভিশাপ তুলে নাও। জল ছাড়া কি মাছ বা মানুষ বাঁচতে পারে!

মৎস্যদেবতা রুষ্ঠ কণ্ঠে বললো, না ঐ বাতাসার লোভ আমার নেই, ওটার জন্য আমাদের সন্তান মাছেরা লালায়িত। তোমার বাতাসা চাইনা আর তোমার অভিশাপও তুলে নেবনা।

:

আকস্মিক ফ্রিয়া উড়ে এলো কোত্থেকে যেন। সে এবার জলদেবতকে বললো, তুমি যদি ওর জল অভিশাপ তুলে নাও, পরিস্থান থেকে আরো অনেক বাতাসা এনে দেব তোমাকে। ফ্রিয়ার কথা শুনে মাছ দেবতা বললো, বাতাসা চাইনা। কেবল তুমি যদি মৎস্যদেবী হয়ে এ দিঘির জলে বসবাস করতে রাজি হও আমার সাথে, তবেই কেবল ওর জল অভিশাপ তুলে নেব।

আমার দিকে তাকালো ফ্রিয়া। তার চোখ জলে টলটল করছে। সে চোখ মুছে বললো, তাই হবে। বিল্টুর জীবন বাঁচাতে তোমার সাথে জলে বসবাস করবো আমি! কথা দিলাম।

জলে নামতে বললো মৎস্য দেবতা ফ্রিয়াকে। আমার হাত ছুঁয়ে আবার চোখ মুছে নিজের শরীরের অর্ধেক জলতলে নিমজ্জিত করলো ফ্রিয়া। জলের ওপরে মুখ রেখে বললো, এবার ওর জল অভিশাপ তুলে নাও।

অভিশাপ তুলে নিয়ে মুহূর্তে ফ্রিয়াকে নিয়ে দিঘির কালোজলে ডুব দিলো মৎস্যদেবতা চোখের পলকে!

:

আমার জন্যে ফ্রিয়া নামের উপুলু দ্বীপের এ সুন্দরী পরীকন্যা বসবাস করবে এ কালোজলের অমান দিঘিতে ঐ কুৎসিত রাক্ষুসে মাছের সাথে। তা কোনভাবেই মানতে পারছিলাম না আমি। তাই তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম পুরনো ইরানি জাহাজে যাবো এই জলদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বিকে তুলে আনতে। নৌকোসহ বন্ধুদের নিয়ে উপস্থিত হলাম ইরানির মাস্তল বরাবর। কিন্তু হায়! আমাকে এখনতো আর ভয় করেনা জল। সুতরাং জল ঠেলে ডুব দিয়ে

পুরনো জাহাজে ঢুকতে পারলামনা শত চেষ্টা করেও। বার বার জল ঠেলে ব্যর্থ হয়ে ঘরে রাখা সাঁতার কাটার পুরনো ফিন আর চোখে লাগানো পানিরোধক গ্লাস পরে আবার নামলাম জলে। কিন্তু রুদ্ধ শ্বাসে ভেতরে ঢুকতে পারলাম না জাহাজের। অবশেষে বুদ্ধি করে ফ্রিয়ার বাতাসা ছুড়লাম জাহাজের খোলে। গন্ধ পেয়ে শ্যামলরঙা জলেদেবতা এলো কাছে। তাকে দলবলসহ নৌকার কাছে এনে বিশেষ জালে তুললাম তাৎক্ষণিক। জলপূর্ণ বিশেষ পাত্রে অতি সাবধানে তাদের এনে ফেললাম আলোচিত দিঘিতে। যেখানে ফ্রিয়া বন্দী আছে কাল জলের দিঘিতে।

:

রাতে স্বপ্নে দেখা দিলো ফ্রি। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো, তোমার পাঠানো জাহাজের শ্যামল দেবতা পরাস্থ হয়েছে কালদিঘির জলদেবতার কাছে। দলবলসহ নিহত হয়েছে সে এ দিঘির বিশাল বাহিনির কাছে। জানতে চাইলাম কিভাবে উদ্ধার করবো তবে তোমাকে ফ্রিয়া? ফ্রিয়া বললো, তুমি কি দিঘির সব জল তুলে ফেলতে পারবে? এখানে জলদেবতা একজন কিন্তু তার অনুসারী অন্যান্য জংলি মাছ প্রায় হাজার পাঁচেক। যাদের অনেকের আছে বিষাক্ত কাটা! সব জল তুলে ফেললে সকল মাছ মারা যাবে বলে তারা হয়তো বাধ্য করবে জলদেবতাকে তোমার সাথে শান্তিচুক্তি করতে তথা আমাকে ছেড়ে দিতে!

:

বিশাল এ দিঘির জল তোলা কি সম্ভব কতিপয় গ্রাম্য কিশোরের পক্ষে! ৩-মাইল দুরের শ্রীপুর বাজারে ছিল বিএডিসির সেচপাম্প কেন্দ্র। সেখানের সেন্টার ম্যানেজারের সাথে আগেই পরিচয় ছিল আমার। আমাদের জমিতে ইরিব্লক করার সময় একবার পাম্প ভাড়া এনেছিলো আমাদের কৃষি পরিবার তার কেন্দ্র থেকে। তখন দুতিনবার ভাত খেয়েছিল দুপুরে আমাদের বাড়িতে। তাই খুলে বললাম সব ঘটনা। সব শুনে তিনি বললেন, ৪০-টা পাম্পের ব্যবস্থা করতে পারবেন তিনি কিন্তু ডিজেলের ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। তার সহযোগিতায় দিঘির একদিকে লাগানো হলো ৪০-টি বড় পাম্প। তার জল যেন সব নদীর দিকে যায়, তাই প্রায় আধা কিলোমিটার সংযোগ খাল কাটতে হলো আমাদের দিনরাত পরিশ্রম করে। বাজারের দোকানিরা এ প্রাণদায়ী কাজে আমাদের পাম্প চালাতে দিলো ২-ব্যারেল ডিজেল! কিন্তু পুরো দিন ৪০-টি পাম্প চালিয়েও দিঘির জল এক ইঞ্চি কমানো গেলনা। শেষে বিএডিসির সেচ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, সম্ভবত নদী বা নিকটবর্তী সাগরের সাথে দিঘির তলদেশ দিয়ে সংযোগ আছে, যে কারণে ৪০ কেন ৮০ পাম্প লাগিয়েও এ দিঘির জল শুকোনো যাবেনা। এবার সকল পাম্পখুলে তার লোহার পাইপ ইত্যাদি আবার ৩-মাইল দুরের শ্রীপুর বাজারে ফেরত দেয়ার এক বিশাল ঝক্কির পালা আমাদের!

:

প্রতিবেশি ঠাকুর হরলাল মন্ডল সব শ্রম পর্যবেক্ষণ করছিলেন এ কদিন থেকে। শেষে তার ঘরের পুরনো জীর্ণ পুঁথির পাতা খুলে ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, জলদেবতাকে পরাস্থ করার পৌরাণিক যজ্ঞ ঔষধির কথা আছে দেড়শ বছরের এ পুরনো পুঁথিতে।কিন্তু তার জিনিসপত্র জোগার করতে পারবে তুমি এটা মনে হয়না আমার। আর ৮০-বছরের বৃদ্ধ আমি! তাই কেবল এ পুঁথির বলা মন্ত্র ছাড়া আর কোনভাবে কি কোন সহায়তা করতে পারবো তোমাকে? ভূর্জপত্রে হাতে লেখা আসাম কিংবা কামরুপের প্রাকৃত ভাষাতে লেখা পুঁথিমত জলেদবতাকে পরাজিত কিংবা নিধন করার মন্ত্র আর তার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধি জীপনপণ বাজি রেখে সংগ্রহ করবো এমন কথা দিলে, ঠাকুর মন্ডল জোগার করতে বললেন শকুনের ডিম, প্যাঁচার তাজা পায়খানা, গো-খুরের জলা পানি আর গো-সাপের পিত্তরস। এ সকল জিনিসপত্রের নির্যাস করে তা একসাথে বিশেষ মন্ত্রপাঠে অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার রাতে ঐ দিঘিতে ফেললে, দিঘির সকল রাক্ষুসে মাছ মারা যাবে জলদেবতাসহ। তখন মুক্তি পাবে উপুলু দ্বীপের পরী ফ্রিয়া!

:

শকুন দূরাকাশে উড়তে দেখেছি তবে তার বাসা বা ডিম দেখিনি কখনো। খোঁজ নিয়ে জানলাম, অন্তত ১০-মাইল দূরের এক বাগানে বিশাল পুরনো রেইনট্রি গাছে বসবাস করে বেশ কটি শকুন। নিরঞ্জনকে অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে ওঠালাম গাছে। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে সে শকুনের বাসার কাছাকাছি গিয়ে পিচ্ছিল শ্যাওলাপড়া ডাল ভেঙে পড়ে গেল প্রায় ৩০/৪০ ফুট নিচে। শকুনের ডিম নয় এবার তাকে নিয়ে তখন ত্রাহি অবস্থা আমাদের। ২য় দিনে

বন্ধু রফিক উঠলো গায়ে ছাই মেখে, যাতে পিছলা গাছ থেকে ফসকে পড়ে না যায় নিচে। কিন্তু বিফল হয়ে সে নিচে নামলো শকুনের ডিমের দুটো খোসা নিয়ে। যাতে বাচ্চা ফুটে তা বড় হয়ে চলে গেছে তাদের গন্তব্যে। সব শুনে বৃদ্ধ ঠাকুর মন্ডল বললেন, চুন মিশ্রিত পচা মাংস খাওয়াতে পারলে ২/৪ দিনের মধ্যে ডিম পারবে শকুনে। না হলে ডিম পারতে আবার ২/৩ মাসও সময় লাগতে পারে। খালে ভেসে যাওয়া মরা গরু টেনে এনে, তার রানের মাংস কেটে তাতে সাদা চুন মাখিয়ে তা টানিয়ে রাখলাম ১০ মাইল দুরের সেই বুনো বুড়ো রেইনট্রি গাছের ডালে। এবং শকুনে তা খেলো কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম দুরে ওঁৎ পেতে সবাই। দুদিন গাঁয়ের বাগানে প্যাঁচার ফোঁকড়ে অপেক্ষা করার পর সংগ্রহ করতে পারলাম প্যাঁচার কাংখিত বিষ্ঠা। নদীর ঢালে নরম কাদা মাটিতে গরুর পায়ের গর্তে জমা জল সংগ্রহ করলাম বিশেষ পাত্রে। গর্ত থেকে লেজ ধরে গো-সাপকে টেনে বের করার সময় গ্রাম্য গুইল ঘুরে কামড়ে দিলো বন্ধু বজলুর হাত। তারপরো সে ছাড়লো না ঐ বুনো গোসাপকে। তাকে কেটে পিত্তরস সংগ্রহ করা হলো গোসাপের। সব জোগার করে জমা রাখা হলো ঠাকুর মন্ডলের কাছে। এবার কেবল শকুনের আন্ডার অপেক্ষা। অধৈর্য বন্ধুরা বলতে থাকলো, চল শকুন ধরে তার পেট কেটে বের করে আনি ওর ডিম! আরো ৪-৫ দিন বৃক্ষ পর্যবেক্ষণ করার পর পাওয়া গেল শকুনের একটা সবুজাভ ডিম। ডিম হাতে নেয়ার পর ৪/৫ বার বাহক সেলিমকে মাথা আর চোখে আঘাত করলো উড়ন্ত শকুন। আমরা ক্রমে ঢিল ছুড়ে তাড়াতে থাকলাম মা শকুনকে। অতি সাবধানে ডিম নিয়ে সেলিম নামালো নিচে!

:

সকল জিনিসপত্র হাতে পেয়ে কাকা ঠাকুর মন্ডল বিশেষ যত্নে তৈরি করলেন জলদেবতা নিধনের প্রাণঘাতি নির্যাস! পরবর্তী পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম সবাই। নির্দিষ্ট রাতে ফকফকা ভরা চাঁদরাতে দিঘির পারে সবাই দাঁড়ালাম আমরা। বার কয়েক বিশেষ মন্ত্র পাঠ করলেন ঠাকুর। মন্ত্রের টানে কিংবা ভরা জ্যোৎস্নার মোহময়তায় জলদেবতা মাথা তুললো তার দলবলসহ। ভরা চাঁদ জ্যোৎস্নায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম কালো মাছগুলোর নড়াচড়া আর মুখগুলো। ক্রমে কাকা ঠাকুর জলে নিক্ষেপ করতে থাকলো তার নিজহাতে বানানো নির্যাস। পর পর ১৯ বার ছোট ছোট নির্যাসের টুকরো জলে নিক্ষেপের পর জলদেবতাসহ সকল মাছগুলোকে নিজেদের জীবনবাঁচাতে জলতাড়ণা করতে করতে নিমজ্জিত হতে থাকলো জলতলে। ঠাকুর বললেন, এখনই ক্রমে মারা যাবে সবাই।

:

কিন্তু মাছেদের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার আগেই ঠাকুর ঢলে পড়লেন পাশের ঘাসবনে। তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নেয়ার পর জল খেতে চাইলেন তিনি। মুখের কাছে জল ধরতেই তা লাফ দিয়ে সরে গেল দুরে। চামচ দিয়েও জল খাওয়ানো গেলনা

তাকে আর। বোঝা গেল, এবার "জল অভিশাপ" পড়েছে বৃদ্ধ ঠাকুরের ওপর। সম্ভবত জলদেবতা নিধনের মন্ত্রপাঠের কারণে তাকে অভিশাপ

দিয়েছে জলের শক্তিধর জলদেবতা। জল না খেতে পেরে তৃষ্ণায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দেহত্যাগের আগেই কালো দিঘি থেকে মুক্ত বাতাসে উঠে এলো উপুলু দ্বীপের পরীকন্যা ফ্রিয়া! একদিনে ফ্রিয়ার মুক্তি, অন্যদিকে বুড়ো ঠাকুরের মৃত্যুতে আনন্দ-বেদনার এক মহাকাব্যিক জীবনের গল্প রচিত হতে চললো আমাদের জীবনে!

:

ফ্রিয়াকে উদ্ধারের অভিযানে আমার বদলে মৃত্যু হলো বৃদ্ধ ঠাকুরের। তাকে দাহকালে উড়ে উড়ে অদৃশ্য অবয়ব আমাকে দেখালো ফ্রিয়া নিজেকে। বিকেলে ফিরে যেতে চাইলো ফ্রিয়া তার নিজে দেশে মায়ের কাছে! কৃতজ্ঞ নয়নে ফ্রিয়াকে বললাম, তুমি ইউচ হাইতার মায়াবি তুতুলিয়া দ্বীপ থেকে একবার জীবন বাঁচিয়েছিলে আমার। আবার এবার জীবন বাঁচালে এ কালো দিঘির রাক্ষুসে জলদেবতা থেকে। তুমিতো আমার প্রাণদায়ি ফ্রিয়া! তুমি কি থেকে যাবে আমার বাড়ি আমার মায়ের কাছে?

নীলাভ মণির মনোলোভা চোখে জল এনে ফ্রিয়া বললো - তোমার মনে নেই, উপুলু দ্বীপে তুমি ও আমি মাকে প্রতিজ্ঞা করে কথা দিয়েছিলাম, আমি পালাবো না তোমার সাথে কিংবা তুমি ধরে রাখবে না আমাকে! বললাম, হ্যা ফ্রিয়া মনে আছে আমার! তাহলে তুমি কি একবার আমার মায়ের সাথে দেখা করবে? একবেলা সুবাসিত নতুন রাজাশাইল চালের ভাত খাবে তুমি দুধ আর কলা দিয়ে? আমার অশ্রুসিক্ত কথাতে আপ্লুত

হলো ফ্রিয়া। রাতে চাঁদের রুপোলি আলোতে দোতলা ঘরের বারান্দায় আমি আর মা অপেক্ষা করছিলাম খুব নরম করে রান্না করা গরম ভাত, ঘন হলুদাভ দুধ আর সবরি কলা নিয়ে। ফ্রি উড়ে এসে একদম মায়ের বুকের সাথে লাগলো! একান্ত তার কিশোরি কন্যার মত বললো, আপনার হাতে দুধ-ভাত খেয়ে আমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই মা! আপনার ছেলে বিল্টুকে দেবেন আমার সাথে উড়ে যেতে উপুলু দ্বীপে? অনেক যত্নে রাখবো তাকে আমি!

:

এবার জল এলো মায়ের চোখেও! কান্নাভেজা স্বরে সে বললো, বিল্টু ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচবো রে মা! আমি মরে গেলে বিল্টুকে নিয়ে যেও তুমি!

:

আমাকে আর মাকে জড়িয়ে শেষ বিদায় নিলো ফ্রিয়া। এক পরী আর দুজন মানুষের অশ্রুসিক্ত পথ ভেঙে উড়াল দিলো সে রাতের নীলাকালে। পশ্চিমাকাশে ডুবন্ত চাঁদের ক্ষীণ নীলাভ আলোতেও আমরা পরস্পরের জল চিকচিক চোখ দেখছিলাম। ক্রমে মহাকাশীয় বলয়ে চলমান কাঞ্চনপ্রভা চাঁদোয়া আলোয় দূরাকাশে হারিয়ে যেতে থাকলো ফ্রিয়া। যেন ছোট্ট পরীটির ভালবাসার উজ্জ্বলতার ভেতরে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে এক মৃত জমাট ব্যথার অন্ধকার! আকস্মিক প্রবল বাতাসের এক ছাট এসে দোলা দেয় আমাদের

দোতলা ঘরের টিনের চালে। পাশের বৃক্ষদের প্রেমময় জীবনের বুনো বাতাসেরা যেন ছুঁয়ে যায় ফ্রিয়ার অবয়বে! ফ্রিয়া নামক দুরদেশের এ কষ্টনারীর শিশিরভেজা রাতের একাকি ধুসর পথের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকি আমরা! কখন পূবাকাশে আলোর বিচ্ছুরণ ঘরে টের পাইনা আমি কিংবা মা! আসলে জীবনের এসব প্রেমময়তা, জল, ঘাস, পাখি আর বুনো লতার মাঝে লুকিয়ে থাকে আমাদের কষ্টবেদনাগুলো। বায়ান্ন গলির তিপ্পান্ন মননের সংহত আবেগ আর চঞ্চলতার মাঝেও আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষা করতে এইসব ফ্রিয়া পরীদের জন্যে! যারা হারিয়ে যায় কখনো উপলু দ্বীপে কিংবা সামুদ্রিক বুনো বাতাসে!

<u>বেদশ্রুতি পাল</u>

বেদশ্রুতি পাল

সব টুকুই আমার চাই

- নীল-অভিজিৎ

মনে হয় আমি বিশ্বগ্রাসী...

সব টুকুই আমার চাই,

প্রথম সূর্যকিরণ শিশিরে যেভাবে

জলকণার অস্তিত্ব কাছে আনে...

রোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে তোলা

ঠিক সেই ভাবেই আবেশিত হয়ে পড়ি

অন্ধকারে তারা দেখতে দেখতে...

রাত না থাকলে অনেক কিছুই অপ্রাপ্ত

জোনাকির আলো দেখাও অসম্ভব

ঠিক যেমন রাত নামলেই দিনের আশা

নদী দেখলেই আশা বাড়ে ঝর্ণার সন্ধানে

সাগরের কাছে পোঁছালেই

উদ্দাম ঢেউয়ে মন উথালপাতাল

ঠিক তেমনই পাহাড়ে পৌঁছে

আকাশের দিকে হাত বাড়াই

থমথমে ঠান্ডা ঠান্ডা শান্তির ছোঁয়াছুঁয়ি

আর আশ্চর্যজনক শব্দের প্রতিধ্বনি

উঁচু হতে দেখা ছোটছোট সারিসারি

নিচু গাছপালার মাথা গুলো

আঁকাবাঁকা পথের গতিবিধি

আহা পরম প্রাপ্তি

সব টুকুই আমার চাই,

সব পাওয়ার বিশ্বাস এই জীবনেই

জীবন যেমন চলমান মৃত্যু তেমন চিরশান্তি

জীবন থাকলে মৃত্যু অনিবার্য

যারা মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে

তারাই জন্মান্তরবাদের গল্প বলে

পরজন্মের গল্পকথায় আমি বিশ্বাসী নই

যাকিছু পাওয়ার আছে এই জন্মেই

সব টুকুই আমার চাই...

স্বপ্ন পরী

★★★ মানবেন্দ্র মজুমদার ★★★

খাওয়ার আগে পাচ্ছে খিদে
ঘুমের আগে পাচ্ছে ঘুম
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন পরী
চাঁদের আলোয় রাত্রি নিঝুম ।

নাইবা জানুক ফারাক তবু
চলছে ঘুরে আপন মনে
সুখ দুঃখ কান্না হাসি
চক্রাকারে ঘুরছে সনে।

রাতের আগেই হচ্ছে বিকেল
তারও আগে সকাল ছিল
তার আগেতে কেমন করে
আঁধার করে রাত্রি এলো!!

দুঃখ ছাড়া সুখ আসেনা
কান্না ছাড়া হয়না হাসি
বলতে পার দুঃখ ও সুখ
বসত করে পাশাপাশি।

চলার আগে ছিল থামা
তাইতো এলো চলার মানে,

ধরিত্রী তো ঘুরেই চলে
থামা চলার ফারাক জানে?

হামা দিয়ে হাঁটতে শেখা
দৌড়টি শুরু তারপরেতে
ফিরে আবার চেষ্টা হাঁটার
বৃদ্ধকালের সেই প্রভাতে।

টলমল পায় প্রথম হাঁটার
স্মৃতি কারও রয়না মনে
শেষ জীবনে সেই হাঁটাটাই
ব্যাথা জমায় মনের কোণে।

রাত বাড়লেও পায়না খিদে
ঘুম আসে না চক্ষু জুড়ে
হারিয়ে গেছে স্বপ্ন পরী
খাঁচার পাখি যাবে উড়ে।

<u>অহেনজিতা সাহা</u>

আমার সার্থকতা

শিউলি সেন

ফিরে পাবো বলে চাই নি তো কিছু ,
শুধু এসেছি জানাতে ,
যা তুমি হারিয়েছো ,
তার অভাব তোমায় ভাবতে হবে |
আমার হারানো সব বিধাতার
লেখনিতে মেনে নিয়েছি ,
তার ইসারাতে তোমায় সবটুকু দিয়েছি |
আমি সর্বশান্ত এটা তোমার
ভুল ধারণা ,
আমি যে সততার সাথে দিয়েছি ,
এটাই আমার আসল প্রেরণা |
তবে সত্যি একটাই,
আমি মানুষ চিনতে ভুল করেছি ,
তাতে কি ,
শেষেই হোক সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি |

তোমার ধারণাতে আমি যেমন ,

সেটা তোমার ধরনের বাস্তব ,

আমার কাছে আমি যেমন ,

সেটাতেই আমি রয়ে যাবো সার্থক |||

আহেলি সাহা

হবো ইতিহাস

অমিতাভ চক্রবর্তী

এখনো শুয়ে আছে রাস্তার কুঁড়ে ঘরে বিপন্ন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের বস্তির ত্রাণকর্তার একজন রাষ্ট্রদূত

এমন একজন মানুষের আবির্ভাব হবে

যিনি হবেন মনুষ্যত্বের পূজারী

যিনি লিখবেন জনগণের নিপীড়ক দের কথা

যারা প্রতিবাদের স্লোগান ও হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে

তিনি জানাবেন শিক্ষার আলোকে প্রবহমান সবই পৃথিবীর পাঠশালায়

একদিন এই শোষিত লাঞ্ছিত গরীব ঘরের সন্তান

যিনি ঘুচিয়ে দিতে সাহায্য করবেন উঁচু নিচুর ব্যবধান প্রতিটি প্রান্তরে প্রান্তরে

প্রতিদিন যা দেখছি কি করে দেখাবো

শুনতে পাই ভিক্ষার কাকুতি আদেশ

ক্ষমতাধারী শাসকদলের প্রতিবাদ প্রতারণা

মিথ্যা অজ্ঞানতা দম্ভোক্তি বক্রক্তি

চারিপাশের বারুদের ঘ্রাণে আতঙ্কিত পৃথিবী সূচনায় দেখেছি তুষার ঝঞ্ঝা ভূমিকম্পের আগমন

রঙীন স্বপ্নের জীবন যাত্রার প্রতীক

যুগের কৌশলে বাজিয়ে দেখে

যা দরকার তা গ্রাস করেছে বাহুবলে

সাক্ষাতের সময় ঠিক করবে নব অঙ্কুরিত ইতিহাস।

<u>অনিন্দিতা পোদ্দার</u>

প্রিয়াঙশু তন্ত্র

ইচ্ছে সবার

প্রিয়াংশু তন্ত্র

প্রথম শ্রেণী

উঠতে বসতে বাবা বলেন
বলবো তোকে কি আর,

হতেই হবে তোকে দেশের
বড়ো ইঞ্জিনিয়ার।

মা তাই শুনে কন বাবাই তুই
আমার কথা রাখ,

ডাক্তারিতে হয় যেনো তোর
নামডাক।

একই সঙ্গে সবাই বলেন
অন্য কিছু নয়,

এবার তোকে হতেই হবে
ইস্কুলে ফাস্ট বয়।

কিন্তু আমার তো ইচ্ছে করে
ঘুড়ি ওড়াই আর,

ক্রিকেট খেলি, সাঁতরে করি
বড় দীঘি পার।

কিন্তু সেসব করতে গেলে,
সবাই আসে তেড়ে,

সবাই বলেন মন দে পড়ায়
এক্ষুনি সব ছেড়ে।

এক একজনের এক এক ইচ্ছে সবাই দিচ্ছে তাড়া,

তার ফলে ভাই আমার নিজের

ইচ্ছে গেছে মারা।

চেতন

পাপড়ি দেব

শহরের জনবহুল এলাকায় বিক্রি করি কবজ, মাদুলি,শেকড় বাকর।

""অব্যর্থ এই তাবিজ কবজ মাদুলি। আসুন আসুন নিয়ে যান।কঠিন অসুখ, সংসারে অশান্তি, পরীক্ষা পাশের মন্ত্র দিয়ে বানানো, বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে বানানো, জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে আসুন। মাত্র পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা।""

প্রতিদিন এক বুলি আমার। কিন্তু সেই দিন এলো এক ছোট্ট মেয়ে।হাতে পঞ্চাশ টাকা।তার মা বিছানায় আছে পড়ে। শেষ চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছেন সব ডাক্তার। মাদুলি চায় সে চায় শেকড় বাকর। আমি থরথর কাঁপি তার নিষ্পাপ মুখখানি দেখে। আমি মিথ্যার ভাত খাই গো মা।এসব মিথ্যা।কেউ পারে না ফেরাতে যদি সে ডাকে।কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবো এই পবিত্র শিশু কে? ছুঁড়ে ফেলি আমার মিথ্যার পসরা।

শেষের কথা

চলে গেলেন অনবদ্য ছড়াকার শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ মজুমদার। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কে জানে কোন দূর আকাশের নীলে

যাচ্ছো তুমি মেঘের ভেলায় বাতাস নদীর জলে

ছড়ার দানা ছড়িয়ে আছে ছোটবেলায় যার

সেই তো পাবে তোমার পরশ জীবন বোধের সার।

প্রণাম নিও কবি।

প্রচ্ছদ -- সঙ্কর্ষণ মজুমদার

পিডিএফ নির্মাণ -- নন্দিতা সাহা

ধন্যবাদ দিয়ে যাদের কোন ঋণ শোধ হবে না।

ধন্যবাদ...